দুইদফা আন্দোলন: এখন সময়ের প্রয়োজন

ড. ফজলুল হক সৈকত

আন্দোলন, বিদ্রোহ ও বিজয়ের আনন্দ অর্জনে বাঙালি জাতির ইতিহাস বেশ উজ্জ্বল। নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ইংরেজ-হটাও আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান অতঃপর স্বাধীনতার জন্য একদফা ম্যুভমেন্ট- এসব সংগ্রাম-প্রতিবাদের বীরগাঁথা আমাদের ঐতিহ্যের অহংকার। এই ঐতিহ্যের ডানায় ভর করে আমরা পরবর্তীকালে বাকশাল বিতারণ, স্বৈরশাসক অপসারণ, সংক্ষিপ্ততম সংসদ যাপন, তত্ত্বাবধায়কদের অবৈধ অসীম দৌরাত্ম্য এবং বিগতপতিত স্বৈশাসকের হাত ধরে গণতন্ত্রের পতাকাবাহী জননেত্রীর নবতর গণতন্ত্র উদ্‌যাপন করেছি এবং করে চলেছি। তেল-গ্যাসসহ যাবতীয় জাতীয় সম্পদ রক্ষা, দ্রব্যমূল্যের চিরায়ত উর্ধ্বগতির বিরুদ্ধে ছুঁড়ে দেওয়া দীর্ঘশ্বাস, টিপাইমুখের বাঁধ সমাচার, ট্রানজিট সুবিধা-অসুবিধা, যুদ্ধাপরাধী অথবা মানবতাবিরোধীদের বিচারের বহুল আলোচিত ব্যাপক প্রস্তুতি, প্রধান বিচারপতি নিয়োগে উপর্যুপরি উচ্চলম্ফ, ডক্টর ইউনুস উপাখ্যান, কাঁচাবাজার আর শিক্ষাবাজারের পার্থক্য অন্বেষা, সংবিধানের সংশোধন মহড়া এবং ইডেন-ভিকারুন্নেসাসহ আরো কিছু বিপত্তির পথ অতিক্রম করতে করতে ভিশন (ভীষণ নয়) আর মিশনের মাড়াইকলে পিষ্ট হয়ে কাতরাতে-থাকা বাঙালি (বাংলাদেশীরা) মহাবিপদের সাত নম্বর সংকেতের সাইরেনে কান পেতে, দুই হাঁটুর নিবিড় ওমে মাথা চেপে, বসে আছে!

আর অপরপীঠে, অন্তত আরো বছর দশেক বিরতিহীনভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার স্বপ্নকে আজীবন এবং বংশপরম্পরায় বিস্তৃত করার লক্ষ্যকে ভিশন ভিশন বলে জনগণকে স্বপ্নবাজ বানিয়ে কিংবা আরো কিছু জমি-টাকা আর জলাশয় বা দ্বীপ (ব-দ্বীপও হতে পারে) নিজেদের কব্জায় নেওয়ার মিশনে (জাতিসংঘের কোনো শান্তি মিশন নয়) অথবা পুনরায় ক্ষতা পেলে কী কী করবো তার তালিকার খসড়া প্রস্তুত করতে করতে কেউ কেউ মাদকতাময় জীবন পরমানন্দে অতিবাহিত করছেন। অবশ্য এক পক্ষ অন্য পক্ষকে চোর ও দুর্নীতিবাজও বলছেন- চৌদ্দ কোটি জনগণ তাদের সঙ্গে আছে এমন দোহাইও সমানভাবে দিচ্ছেন উভয় পক্ষই।

বীরের জাতি বাঙালি (অবশ্য পলায়নের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে- রাজা লক্ষণ সেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রমুখ সে বিচারে ইতিহাসের রূপালি পাতায় নায়কের মর্যাদাই পেয়েছেন বটে!) এখন চরম বিপদের ঘিনঘিনে কাদায় পা-আটকে নিজের আস্তিনে মুখ গুজে, সম্ভবত উটপাখির মতো, পড়ে আছে। কেউ কেউ অবশ্য নতুনের বারতা নিয়ে ঘুমকাতুরে সহযাত্রীদের ডাক দিয়ে যাচ্ছেন। আপোসহীন আন্দোলনে কিংবা অবিচার-অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধেও লড়ছেন কোনো কোনো ইনডিভিজ্যুয়াল লড়াকু। এরই মধ্যে কত নতুন ফর্মুলা (ফরমালিন দেওয়া মুলা নয়) এলো, আর কত ফর্মুলা গেল তারও ঠিক হিসাব করা কঠিন। উপরন্তু সংসদের প্রতি অধিবেশনেই উত্থাপন, গ্রহণ কিংবা অনুমোদন হচ্ছে আইনের খসড়া; পুরনো আইনের সংশোধনী কিংবা একেবারে আনকোরা কোনো আইন।

সাধারণ নাগরিকের কাতারে দাঁড়িয়ে, সামান্য এক অধিবাসী হিশেবে, প্রতিদিনের বাড়তে-থাকা অরাজকতা আর অনিশ্চয়তার ভয়াল বহর দেখতে দেখতে, আমার আজকাল (পরশুও বোধকরি) মনে হচ্ছে- যত কথাই আমরা বলি বা লিখি না কেন, যত হরতালই কিংবা করতালিই দেই না কেন, এখন, দুইদফা- এবং আপাতত কেবল দুইদফা আন্দোলনের ডাক দেওয়ার সময় হয়েছে- সময়েরই প্রয়োজনে। কিন্তু কে দেবে এ ডাক কিংবা কে উত্থাপন করবে এ ফর্মুলা বাস্ত

বায়নের খসড়া প্রণয়নের কাজ! অথচ বাংলাদেশের জনগণের (যদিও রাজনীতির ভাষায় জনগণ কেবল ভোটার বা সংখ্যা মাত্র) মুক্তির জন্য আপাতত, অন্তত আমার চোখে (কে জানে হয়তো আরো অনেকের ভাবনায়ও), এর কোনো বিকল্প দেখা যায় না। তবে কী সেই দুইদফা!–

দফা– এক: একজন ব্যক্তি কত টার্ম বা কয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি অথবা সরকারপ্রধান থাকতে পারবেন– তা আইন আকারে পাস করতে হবে।

আমরা জানি, পৃথিবীর যেখানেই গণতন্ত্র এগিয়েছে, সেখানেই ক্ষমতা স্থান পেয়েছে জনগণের হাতে; তারা নির্বাচনে অংশ নিয়ে, ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করছে। আর আমরা এখানে কেবল দুটি পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর, রাগ-বিরাগের ওপর নির্ভর করে, ভাগ্যকে দোষ দিয়ে, কপাল কিংবা বুক চাপড়াচ্ছি। সচেতন নাগরিক মাত্রেই বোধকরি জানেন, রাজনীতি কারো পারিবারিক অধিকার বা উত্তরাধিকার নয়। এই মাটিতে আরো অনেকে রাজনীতি করেছেন– জাতীয় অগ্রগতি ও অর্জনে অবদান রেখেছেন, তাহলে কেন, সময়ের গতির প্রবাহে, রাজনৈতিক (সামাজিক ও অর্থনৈতিক নয়!) স্বাধীনতা অর্জনের কিছুকাল পর থেকে, ঘুরে-ফিরে দুটি পরিবারকে ঘিরে বার বার গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চীৎকার করছি আমরা। আমরা বোধ হয় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি! বায়ান্নোর ভাষা-সৈনিক, একাত্তরের অগণন মুক্তিসেনা আর ডাক্তার মিলন ও নূর হোসেনরা কি এই রকম রাজনীতির রাজত্ব কায়েম করার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন? বীর সেনারা মাঠে-ময়দানে-জঙ্গলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কি এই লক্ষ্য অর্জনের নেশায়? আমার মনে হয়, যখন কোনো ব্যক্তি জানতে পারবেন তার কাজের বা দায়িত্বের (ক্ষমতার নয়) মেয়াদ কতদিন, তখন তিনি অবদান রাখার জন্য বা সুনাম ও খ্যাতি অর্জনের জন্য নিজের দুর্বলতা ও অপকর্মের ইচ্ছা (যদি থাকে) পরিত্যাগ করবেন। আর যদি ধরেই নেন যে, তিনি বা তারাই পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার পাবেন, তাহলেতো আর কারো কথা শুনবার বা পাত্তা দেওয়ার দরকার পড়ে না। (আমাদের দেশে সরকার বা প্রধানমন্ত্রীর কিংবা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাগণ কি একরকম কাঠের পুতুল নন! রাজনৈতিক দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারিসহ অন্যরা কি চব্বিশ ঘন্টা পদ বা দায়িত্ব থেকে অপসারণ অথবা অব্যাহতির আতংকে থাকেন না?– এদেশেতো রাষ্ট্রপতির চাকরিও যায়!)

দফা– দুই: রাজনীতিবিদদের বয়সসীমা নির্ধারণ করে, তা বিল আকারে উত্থাপন এবং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অনেকেরই জানা আছে– আমাদের দেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশ করার এবং অবসর নেওয়ার বয়স নির্ধারণ করা আছে। সব ক্ষেত্রে আবার সীমা-পরিসীমা এক নয়। মাঝে মাঝে, বিদ্যায়তনে সেশনজট বিবেচনায় নিয়ে চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানো হয়; গড় আয়ু বৃদ্ধি, মুক্তিযোদ্ধা কিংবা বিশেষ বিবেচনায় অবসরের সময়সীমাও বৃদ্ধি পায় কারো কারো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো– যারা এগুলো নির্ধারণ করে থাকেন, সম্ভবত রাজনীতিবিদদের ভূমিকাই প্রধান, তাদের কাজ করার বয়সের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আরো মজার ব্যাপার, সরকারি চাকরি থেকে, সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে, অধ্যাপনা থেকে যাদেরকে সরকার মেয়াদ-উত্তীর্ণ বলে বাতিল (অবসরে পাঠানো অর্থে) করে দিচ্ছেন, তারাই (সকলে নন; কেউ কেউ) রাজনীতিতে যোগ দিয়ে এমপি, মন্ত্রী হচ্ছেন। যাকে সচিব, কোনো বাহিনী বা সংস্থার কর্মকর্তা কিংবা শিক্ষকতার পদে আর থাকতে দেওয়া গেল না, বয়সের কারণে, তিনিই কি-না পরবর্তীকালে মন্ত্রী বা উপদেষ্টা হয়ে সচিবকে, সংস্থার কর্মকর্তাদেরকে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করছেন। কাজ করার বা লড়াই করবার কিংবা পাঠদানের সামর্থ্য হারিয়েছেন বলে যাদেরকে তসবি-জায়নামাজ-লাঠি-ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি করুণকণ্ঠে ও কাঁপা হাতে, উপহার স্বরূপ প্রদান করে (ফেয়ারওয়েলেতো এরকমই রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে) বাসায় পাঠানো হলো, তারাই রাজনীতির দুই

জোটের যে-কোনো জোটে ভিড়লে ভাগ্যগুণে পুনরায়, আগের তুলনায় অধিকও বটে, কর্মক্ষম হয়ে ওঠেন! অতঃপর তারা ছড়ি ঘুরাবার অধিকার লাভ করেন, তাদের সেই ভেজাচোখের সহকর্মীদের ওপর! অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধরা রাজনীতির হাল ধরার প্রতিযোগিতায় নামায় এবং একই ব্যক্তি বহুকাল ধরে পদ ও ক্ষমা আঁকড়ে থাকার কারণে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না; রাজনীতির মাঠেও আজ আর তেমন চোখে পড়ছে না তরুণ সম্ভাবনাময় ছাত্রনেতা বা আঞ্চলিক নেতা।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিকের অনেকে দুভাগে ভাগ হয়েছেন- তারাও তাদের চিন্তায় রচনায় স্থান দিয়েছেন তাদের পছন্দের বা প্রশ্রয়দানকারী দল বা জোটের স্তুতি। এমনকি মিডিয়াকেও একপ্রকারে দুধারায় বিভক্ত করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন পাঠক-শ্রোতা-দর্শক। শিক্ষক-চিকিৎসক-প্রকৌশলি-আইনজীবীসহ নানান পেশাজীবীরাও প্রায় পরিষ্কারভাবে কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীকে অপেক্ষাকৃত ভালো বলে অন্য পক্ষকে মন্দ বলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ উপাত্ত হাজির করে, মনগড়া বা পত্রিকার পাতা থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে, তাদের নিজ নিজ বক্তব্যকে জনগণের কাছে পরিবেশন করছেন। কত বোধ্য-অবোধ্য নামে-বেনামে যে চলছে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল, লম্বাটেবিল বৈঠক, মত-বিনিময় ও আলোচনা, তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল। আর সুশীল সমাজতো আমাদের দৃষ্টিসীমা ও শ্রবণভুবন অতিক্রম করে গভীর কোমার পথে ধাবমান! কাজেই সমন্বিত জাতীয় উন্নয়নভাবনা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা আর জাগরণের আহ্বান এবং ওসব পথে যাতায়াতের ব্যাপারাদি ক্রমান্বয়ে ম্যুজিয়মের (জাদুঘর বললে হয়তো কেউ ম্যাজিকহাউজ ভাবতে পারেন) উপাদান হতে চলেছে। ভাগ-বিভাজনতো হতেই পারে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হলো- আদর্শগত বা ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ভিন্নতায় আরোহন না করে কেবল নির্দিষ্ট দুটি পরিবারের ভাবনাবৃত্তে কেন্দ্রীভুত হয়ে পড়েছি; যেন এক অজানা গোলকধাঁধায় পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছি- নিজেদেরই বেখেয়ালে!

সরকারে বা বিরোধীদলে থাকলে হরতাল বিষয়ে কে কী বললেন অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে, আগে ও পরে, কার কী অভিমত, নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিশ্রুত কথামালা- এসব বোধ করি আজ আর আমাদের কাছে কোনো আগ্রহের বিষয় নয়। সত্যি কথা বলতে কী- আমাদের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পত্রিকার পাতায় বা টেলিভিশনে সজিব ওয়াজেদ জয় বা তারেক রহমানের সন্তানাদির ফটোগ্রাফ দেখে ভাবে- একদিন এরাই হবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি। এইসব অসহায় ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরাও আঙুল দিয়ে তেমনটাই বলতে ও বোঝাতে চেষ্টা করেন। এখন আর আমাদের প্রজন্মের সন্তানাদি-শিক্ষার্থী, কৃষক-শ্রমিক বা পরিবর্তনকামীর চোখে দেশগড়ার কোনো স্বপ্ন নেই! কেবল চাকরি, ব্যবসা কিংবা বিদেশপাড়ির কল্পনা। কাজেই দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে পরিবর্তন দরকার, তার কোনো সম্ভাবনাও আজ আর চোখে পড়ে না। এ কোন ক্রান্তিকাল পাড়ি দিচ্ছি আমরা! কখন শুনবো নতুন ডাক! কোথায় সে কাÊারি!

ড. ফজলুল হক সৈকত একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কবি-কথানির্মাতা-প্রাবন্ধিক; রেডিও সংবাদ পাঠক; কলামলেখক।

ই-মেইল: snue90@yahoo.com, fsaikat26@gmail.com, ফোন: ০১৮২৪৫১৬০৮৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন